#আমি পদ্মজা পর্ব ২৫

____

হাওরে বিশাল জলরাশি। কখনো ঢেউয়ে উথাল-পাতাল, আবার কখনো মৃদু বাতাসে জলের ওপর চাঁদের প্রতিচ্ছবির খেলা। নৌকা বাজারের দিকে যাওয়ার পথ ধরেছে। তাই মোর্শেদ নিস্তব্ধ বৈঠক ভেঙে বৈঠা নিয়ে বসেন। নৌকা নিয়ন্ত্রণে এনে রাধাপুর হাওড়ের দিকে যেতে থাকেন। ওড়নার ঘোমটার আড়ালে কখন খোঁপা খুলে গেছে পদ্মজা খেয়াল করেনি। হেমলতা খেয়াল করেন পদ্মজার চুল হাওড়ের জলে ডুবে আছে। তিনি মৃদু স্বরে পদ্মজাকে বললেন,'চুল ভিজে যাচ্ছে পদ্ম।'

পদ্মজা দ্রুত সামলে নিল। খোঁপা করে ঘোমটা টেনে নিয়ে বলল,’কখন খুলে গেছে খেয়াল করিনি।’

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। হেমলতা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছেন এক মনে। পদ্মজা ডাকল,’আম্মা?’

হেমলতা অশ্রুভরা চোখে তাকালেন। পদ্মজা কিছু বলার আগে তিনি বললেন,’পূর্ণা গল্প শুনবি?’

পূর্ণা গল্প বলতে পাগল। সে গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। খুশিতে বাকবাকুম হয়ে বলল,’শুনব।’
‘কষ্টের গল্প কিন্তু।’
‘গল্প হলেই হলো।’

হেমলতা হাসেন। পদ্মজা নড়েচড়ে বসে। সে আন্দাজ করতে পারছে তার মা কোন গল্প বলবে। হেমলতা দু’হাতে জল নিয়ে মুখ ধুয়ে

নেন। এরপর একবার মোর্শেদের দিকে তাকিয়ে হাসেন। পিছন ঘুরে বসে প্রশ্ন করেন,'মুখ না দেখে গল্প শুনতে ভাল লাগবে?'

পূর্ণা মুখ গোমড়া করে না বলতে যাচ্ছিল। পদ্মজা এক হাতে খপ করে ধরে আটকে দিল। মাকে বলল,'সমস্যা নেই আম্মা। যেভাবে ইচ্ছে বলো।'

হেমলতা বড় করে দম নিয়ে বলা শুরু করলেন,'আব্বার প্রথম স্ত্রী মারা যায় অল্প বয়সে। আব্বা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। একজন বুদ্ধিমান, উদার মনের মানুষ ছিলেন। আম্মাকে যৌতুকের জন্য ধাক্কা মেরে বের করে দিল তার প্রথম স্বামী। মুখে তালাক দিল। বাপের সংসারে এসে সমাজের তোপে পড়তে হয় আম্মাকে। আব্বার উদার মন অবলা,অসহায় আম্মাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন।তিনি আমার নানার কাছে প্রস্তাব রাখেন।

নানা সানন্দে রাজি হয়ে যান। রাজি হবেনই না কেন? স্বামীর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া বিবাহিত নারীকে কে ই বা বিয়ে করতে চায়? আম্মা,আব্বার বিয়ের বছর দেড়েক হতেই হানি আপার আগমন। তার দুই বছরের মাথায় আমার আগমন ঘটে।'

'সেদিন নিশ্চয় গাছে গাছে ফুল ফুটেছে।' পদ্মজা বলল,পুলকিত হয়ে।

হেমলতা ম্লান হাসেন। বলেন,'শুনেছি আমার গায়ের রং দেখে আম্মা নাক কুঁচকেছিলেন। আমার বয়স যখন তিন মাস আম্মার আগের স্বামী আম্মাকে ফিরিয়ে নিতে আসে। আব্বার তখন আর্থিক সমস্যা বেশি ছিল। দিনে দুই বেলা খাওয়া সম্ভব ছিল না। বিপদে পাশে থাকা আমার আব্বাকে ছেড়ে,দুই বছরের এক মেয়ে আর তিন মাসের এক মেয়েকে ছেড়ে স্বার্থপর মা পালিয়ে গেল প্রথম স্বামীর কাছে। আব্বা

ছোট ছোট দুই মেয়েকে নিয়ে মাঝ নদীতে পড়েন। কিন্তু আল্লাহ সহায় ছিলেন। আব্বার ফুফু চলে আসেন আমাদের কাছে। আপা আর আমার দায়িত্ব নেন। হুট করেই আব্বার আর্থিক অবস্থা উন্নত হতে থাকে। গৃহস্থিতে রহমত ঝরে পড়ে। পাঁচ বছর পর আম্মা ফিরে আসেন। বিধ্বস্ত অবস্থা। ফর্সা মুখ মারের চোটে দাগে দাগে বিশ্রি হয়ে গেছে। শুধু একা আসেনি। দুই বছরের এক ছেলে নিয়ে ফিরেন। তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরের বদলে বিশাল বাড়ি হয়েছে। আব্বা প্রথম মানেননি। আম্মা আব্বার পায়ে পড়ে কাঁদেন। ক্ষমা চান। আব্বা আবার আগের ভুল করেন। মেনে নেন আম্মাকে। আম্মার ছেলের নাম বিনোধ ছিল, আব্বা নতুন নাম দেন হানিফ। আম্মা আমাকে সহ্য করতে পারতেন না। আব্বার চোখের মণি ছিলাম। আব্বার আড়ালে আম্মার দ্বারা নির্যাতিত হতে

থাকি। ছয় বছর হতেই স্কুলে ভর্তি করে দেন আব্বা। হানি আপা তখন স্কুলে পড়ে। আমি...”

‘থামলে কেন আম্মা?’ বলল পদ্মজা,অধৈর্য্য হয়ে।

হেমলতা ভ্রুকুটি করে বলেন,’আর বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না আম্মার ব্যাপারে। আম্মা অনুতপ্ত এখন। আফসোস করেন। কাঁদেন। বলতে ভাল লাগছে না।’

শীতল বাতাসে সবার শরীর কাঁটা দিচ্ছে। চাঁদটা ছোট হয়ে গেছে অনেক। মোর্শেদ এক ধ্যানে বৈঠা দিয়ে জল ঠেলে দিচ্ছেন দূরে নৌকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে। হেমলতা আবার বলতে শুরু করেন,’মেট্রিক দেয়ার পর আম্মা পড়াতে চাইছিল না। আব্বার জন্য ঢাকার কলেজে পড়ার সুযোগ পাই। হোটেলে উঠি। আব্বা নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। জানিস পদ্ম, কলেজে আমি সবার ছোট ছিলাম। সবাই হা

করে তাকিয়ে থাকতো। শাড়ি পরতাম বলে একটু বড় লাগতো অবশ্য। সবসময় সুতি শাড়ি পরে বেণী বেঁধে রাখতাম। কারো সাথে মিশতাম না। ভয় পেতাম খুব। ভীষণ ভীতু ছিলাম। রিমঝিম নামে খ্রিষ্টান এক মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয়। মেয়েটা এতো সুন্দর ছিল দেখতে। ঠিক পদ্মজার মতো সুন্দর। চোখের মণি ছিল ঘোলা। তার নাকি শ্যামলা মানুষ ভাল লাগে তাই নিজে যেচে আমার সাথে বন্ধুত্ব করে। কয়েকদিনের ব্যবধানে আমরা খুব ঘণিষ্ঠ হয়ে পড়ি। ইংলিশে যাকে বলে,বেস্ট ফ্রেন্ড। রিমঝিমের সাথে মাঝে মাঝে ওর বড় ভাই আসতো। নাম ছিল যিশু। যিশু একদম রিমঝিমের আরেক রূপ।চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য ছিল দুই ভাই-বোনের। যিশু ভাইয়া বলে ডাকতাম তাকে। যিশু ভাইয়া মজা করে বলতেন,’ধর্ম এক হলে হেমলতাকেই বিয়ে করতাম।’ পূর্ণা,পদ্মজা খারাপ লাগছে শুনতে?’

‘না আম্মা।’ এক স্বরে বলল দুজন। পদ্মজা বলল,’পরে কী হয়েছে আম্মা?’

‘তখন অলন্দপুর থেকে দুই সপ্তাহ লাগতো রাজধানীতে চিঠি পৌঁছাতে। কলেজ ছুটির পথে হানি আপার চিঠি পাই। পাশে রিমঝিম ছিল। যিশু ভাইয়া সবেমাত্র এসেছেন রিমঝিমকে নিয়ে যেতে। চিঠি পড়ে জানতে পারি,আব্বা হাওড়ে গিয়েছিলেন মাছ ধরতে। আব্বার পাশের নৌকায় সুজন নামে এক ছেলে ছিল। আব্বার নৌকায় চেয়ে কয়েক হাত দূরে। তখন ভারী বর্ষণ হচ্ছিল। বজ্রপাত হচ্ছিল একটার পর একটা। একটা বজ্রপাত সুজনের উপর পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সুজন ঝলসে যায়। আব্বা ছিটকে পড়েন জলে। দূর থেকে এক দল জেলে ঘটনাটি দেখতে পায়। তারা আব্বাকে তুলে নিয়ে যায় বাড়িতে। এরপর থেকেই আব্বা কানে শুনতে পায় না। ঠিক

করে হাঁটতে পারে না। মস্তিষ্ক অচল হয়ে পড়ে। এই খবর শোনার পর হাউমাউ করে কান্না শুরু করি। যিশু ভাই সব শুনে,আমার কান্না দেখে বলেন,বিকেলের ট্রেনে অলন্দপুর নিয়ে যাবেন। আমি তখনও কাঁদছিলাম। একবার শুধু অলন্দপুর যেতে চাই। আব্বাকে দেখতে চাই। যদিও জানতাম,অনেকদিন হয়ে গেছে এই দূর্ঘটনার।
আটপাড়া পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যায়। বাড়ি এসে দেখি সদর ঘরের দরজায় তালা মারা। কেউ নেই বাড়িতে। মুরগি আর গরু-ছাগল ছাড়া। বারান্দার ঘরে দরজা ছিল না। ঘরও বলা যায় না। শুধু একটা চৌকি ছিল। বড্ড ক্লান্ত ছিলাম। চৌকিতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙে আম্মার চেঁচামেচিতে। যিশু ভাই নিজের অজান্তে আমার পাশে কখন ঘুমিয়ে পড়েন বুঝেননি। তিনি আমার মতোই ক্লান্ত ছিলেন। আমার জন্মদাত্রী মা গ্রামবাসী ডেকে

চেঁচাতে থাকেন। হাতেনাতে ধরার মতো অবস্থা ছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে ভড়কে যাই। কিছু বলতে পারিনি। যিশু ভাই সবাইকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করে, কেউ বুঝেনি। তখন নিয়ম খুব কঠিন ছিল। যিশু ভাই খ্রিষ্টান শুনে সবাই আরো ক্ষেপে যায়। আব্বার সামনে আমাদের দুজনের মাথা ন্যাড়া করে দিল গ্রামবাসী। কোমর সমান চুল ছিল আমার। মাথা ন্যাড়া করতে গিয়ে মাথার চামড়া ছিঁড়ে ফেলে। রক্ত আসে গলগল করে। আম্মার তখন হুঁশ আসে। আমাকে বাঁচাতে আসে,পারেনি। গায়ের রং কালো তার উপর রক্তাক্ত ন্যাড়া মাথা। কী যে বিশ্রি রূপ হয়েছিল। আমি আমার একমাত্র ভরসা আব্বাকে চিৎকার করে ডেকে কেঁদেছি। আব্বা শুনেনি। আমার দিকে হা করে শুধু তাকিয়েছিল। যিশু ভাইয়াকে অনেক মারধর করে। সেদিন রাতেই আহত যিশু ভাইয়াকে ছুঁড়ে ফেলে আসে নদীর পাড়ে।

গরুর ঘরে গোবরের উপর বেঁধে রাখে আমাকে। দূরদূরান্তরের মানুষ দেখতে আসে। আমি তখন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নিজের মৃত্যু কামনা করেছি। একবার বাঁধনছাড়া হলে আত্মহত্যা করব ভাবি। হাত বাঁধা ছিল। দাঁত দিয়ে নিজের হাঁটুতে বোকার মতো কামড় দিতে থাকি একটার পর একটা, যাতে মরে যাই। যে ই দেখতে আসতো সেই বিশ্রি গালি দিয়ে যেত। কেউ কেউ লাথি দিয়েছে। রাধাপুরের হারুন রশীদ আছে না? উনার আব্বা তখন অলন্দপুরের মাতব্বর ছিলেন। উনার গোয়ালঘরেই বন্দি ছিলাম।।দুই দিন পর আমাকে ছাড়ে। ছাড়া পেয়েই ইচ্ছে হচ্ছিল, গলায় কলসি বেঁধে ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেই। কিন্তু পারিনি। শরীরে একটুও শক্তি ছিল না। দৌড়ে পালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি গোয়ালঘরের বাইরে। ধারালো কিছু একটা ছিল মাটিতে। মাটিতে পড়তেই হাতের বাহু ছিঁড়ে

গলগল রক্তের ধারা নামে। এই যে আমার বাহুর দাগটা। এটা সেদিনই হয়েছে।’

হেমলতা মেয়েদের দাগটা দেখানোর জন্য ঘুরে তাকান। দেখেন তার দুই মেয়ে মুখে হাত চেপে কাঁদছে। হেমলতা হাসার চেষ্টা করে বললেন,’তোরা মরাকান্না শুরু করেছিস কেন?’

হেমলতার কথা শেষ হতেই ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুই মেয়ে ছুটে আসে তার দিকে। নৌকা দুলে উঠে। হেমলতা চমকে গিয়ে দ্রুত নৌকা ধরেন। চিৎকার করে উঠেন,’আরে...’

কথা শেষ করতে পারেননি। তার পূর্বেই বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই মেয়ে। জড়িয়ে ধরেই আম্মা আম্মা বলে কাঁদতে থাকে। দুই মেয়ে এতো শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে যে,হেমলতার মনে হচ্ছে এখুনি দম বেরিয়ে যাবে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। হেমলতা দুজনের পিঠে হাত বুলিয়ে স্বান্তনা দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তারা

কেঁদে চলেছে। হেমলতা মোর্শেদের উদ্দেশ্যে বলেন,'নৌকা ঘুরাও। এদের আর কিছু বলব না। আর ঘুরব না।'

পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকে বলল,'আর কাঁদব না। পূর্ণা আর কাঁদিস না। কিন্তু তোমাকে জড়িয়ে রাখব।'

হেমলতা পদ্মজার মাথায় চুমু দিয়ে বললেন,'আমাদের এক ঘরে করে দেওয়া হলো। বাজারে ভেষজ উপায়ে আব্বার চিকিৎসা চলছিল। সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। কেউ আমার পরিবারের মুখও দেখতে চায় না। দেখলেই এটা ওটা ছুঁড়ে দিত। বলা হয়নি,সেদিন রাতে আব্বা,আম্মা,হানিফ মামার বাড়ি ছিল। মামার বাড়ির পাশের বাড়িতে ডাক্তার ছিল একজন। আব্বাকে দেখাতে গিয়েছিল। হানি আপার বিয়ে দেয়ার জন্য আম্মা উঠেপড়ে লাগে। তখন হিমেল আম্মার

পেটে। সাত মাস চলে। আমার উপর আম্মার মার প্রতিদিন চলতেই থাকে। আমার জন্য পরিবারের এতো ক্ষতি হলো। হানিফ স্কুলে যেতে পারে না। সবাই দূর দূর করে। হানি আপার বিয়ে হয় না। আব্বার চিকিৎসা হয় না। বিপদ-আপদে কেউ পাশে আসে না। ওদিকে হিমেল আসার সময় ঘনিয়ে আসছে। কোনো দাত্রী আসেনি। আম্মা একা যুদ্ধ করে হিমেলকে জন্ম দিল। সব মিলিয়ে জীবনটা নরক হয়ে উঠে আমার। বছর দুয়েকের মধ্যে আব্বা কিছুটা সুস্থ হয় আল্লাহর রহমতে। হাঁটাচলা করতে পারেন। আগের মতো সবকিছু না বুঝলেও মোটামুটি বুঝতেন। হানি আপার বিয়ে ঠিক হলো। বনেদি ঘর থেকে প্রস্তাব আসে। শর্ত পাঁচ বিঘা জমি দিতে হবে। আমাদের জমি ছিল সাড়ে পাঁচ বিঘা। আম্মা পাঁচ বিঘা জমি দিয়েই হানি আপার বিয়ে দিলেন। সবকিছু স্বাভাবিক হয়। যদিও মাঝে

মাঝে অনেকে কথা শুনিয়েছে। একসময় আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে। তোদের আব্বার সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে জানতে পারি তোদের আব্বার দ্বিতীয় স্ত্রী আমি।'

শেষ কথাটা হেমলতা মোর্শেদের দিকে তাকিয়ে বলেন। মোর্শেদ চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নত হন। পূর্ণা খুব অবাক হয়ে মোর্শেদের দিকে তাকাল। হেমলতা পূর্ণাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলেন,'আব্বাকে ভুল বুঝিস না মা। ভালোবাসার উপর কিছু নেই। ভালোবেসে লুকিয়ে বিয়ে করেছিল। কিন্তু আমাকে জানতে দেয়নি। একসময় বিরক্ত হয়ে অনেক মারধোর করে। ভীষণ বদমেজাজি আর জেদি ছিল তোদের আব্বা। জোর করে তোদের দাদা বিয়ে করিয়েছেন। তাই রাগ মেটাতো আমার উপর। আচ্ছা বাদ সেসব কথা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ

শুরু হয়। জান বাঁচানোর তাগিদে মানুষ পালাতে থাকে। অলন্দপুরে পাকিস্তানি ক্যাম্প তৈরি হয়। শহর থেকে একটা দল আসে যারা যুদ্ধ করতে চায় তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে। তোদের আব্বা তার প্রথম স্ত্রীর কাছে বেশি থাকতো। আর তোর দুই চাচা যুদ্ধে চলে যায়। আমি একা ছিলাম খালি বাড়িতে। চারিদিকে অত্যাচার, জুলুম। ইচ্ছে করে দেশের জন্য কিছু করতে। মনে সাহস নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি কমান্ডার আবুল কালামের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। প্রধান শিক্ষক গোপনে গ্রামের যুবক-যুবতীদের অনুপ্রেরণা দিতেন যুদ্ধের জন্য। এ খবর একসময় পাকিস্তানিরা পেয়ে গেল। তিনি শহিদ হলেন। ট্রেনিং-এ জয়েন করি। হয়ে উঠি একজন মুক্তিযোদ্ধা। প্রথম অপারেশনে আমরা সফল হই। অলন্দপুরের ক্যাম্প উড়িয়ে দেই। এরপর চলে যাই আরেক

এলাকায়। হাতে রাইফেল নিয়ে পরবর্তী অপারেশনে নামি। তখন ধরা পড়ে যাই পাকিস্তানিদের হাতে। বন্দি করে কারাগারে। স্বচক্ষে দেখি ধর্ষণ,শারিরীক অত্যাচার। কী বর্বরতা তাদের! রড দিয়ে পিটিয়েছে। পিঠের দাগগুলো এখনো আছে। আরো কয়দিন থাকলে হয়তো আমিও ধর্ষণ হতাম। তার আগেই আবুল কালামের বুদ্ধির কাছে হেরে গেল তারা। ফেরার আগে চোখ বন্ধ করে এক নিঃশ্বাসে দুইজনকে ছুরি দিয়ে মৃত্যুর দোয়ারে পাঠিয়ে আসি। দেশ স্বাধীন হয়। চারিদিকে স্বাধীনতার উল্লাস। হাসপাতালে তখন ভর্তি আমি। আরো অনেকে ছিল। সেই হাসপাতালেই ভর্তি ছিল যিশু। সেও একজন মুক্তিযোদ্ধা। রিমঝিমের সাথে ফের দেখা হলো। এক মাস লাগলো সুস্থ হতে। ফেরার সময় সাথে আসে রিমঝিম আর যিশু ভাইয়া। পথে বার বার করে বলি, তোমাদের মতো

দেখতে যেন আমার একটা মেয়ে হয়। অলন্দপুরের বাজারে নামিয়ে দিয়ে ওরা আর আসেনি। ফের যদি গ্রামের লোক দেখে ফেলে। কিন্তু আশঙ্কাই ঠিক হলো। অনেকে যিশু ভাইয়ের সাথে আমাকে দেখে ফেলে। বাড়িতে ফিরে তোর আব্বাকে দেখি। তিন মাস পর জানতে পারি আমার পদ্ম আমার পেটে। মনে প্রাণে একটা সুন্দর মেয়ে চাইতে থাকি আল্লাহর কাছে। ঘুমালে স্বপ্ন দেখি রিমঝিমকে। আমার মন খুব চাইতো রিমঝিমের মতো সুন্দর মেয়ে। ঠিক তাই হলো। কিন্তু বদনাম রটে গেল। অনেকে বলে তারা যিশুর সাথে আমাকে দেখেছে। এতদিন যিশুর কাছে ছিলাম।।তারই সন্তান পদ্মজা। এজন্যই এত সুন্দর। আর এতো মিল। তোদের আব্বাও বিশ্বাস করল। আল্লাহ চাইলে সব পারে কেউ বিশ্বাস করল না। কিন্তু জানিস পদ্ম? তুই জন্মের পর থেকেই আমি অলৌকিক ভাবে খুব শক্ত আর কঠিন হয়ে

পড়ি। কেউ কিছু বললে, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দেই। তোর সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে আসলে দা নিয়ে তেড়ে যাই। এ খবর ছড়িয়ে পড়ে সব জায়গায়। তার মধ্যে কমান্ডার আবুল কালাম আসেন অলন্দপুরে। গ্রামের অনেকে যুদ্ধে গিয়েছিল। আমি ছাড়া আর একজন ফিরেছিল। বদর উদ্দিন নাম। বদর উদ্দিন এবং আবুল কালামের কাছ থেকে গ্রামবাসী জানতে পারে আমিও যুদ্ধ করেছি। হেমলতা একজন মুক্তিযোদ্ধা। এ খবর শোনার পর থেকে সবাই মোটামুটি সমীহ করে চলতে থাকে। একটা শক্ত জায়গা দখল করে বাঁচতে থাকি। প্রতিটি ঘটনা আমাকে ভেতরে ভেতরে শক্ত করেছে। তুই জন্মের পর বুঝেছি, আমি অনেক কিছু পারি। একা চলতে পারি। ‘

কথা শেষ করে হেমলতা হাঁফ ছাড়েন। চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ আগে। কিছুক্ষণের

মধ্যে ফজরের আযান পড়বে। পদ্মজা,পূর্ণা স্তব্ধ।

‘এই দুনিয়ায় বাঁচার দুটি পথ- চুপ থাকো, নয় প্রতিবাদ করো। কিন্তু আমার নিয়ম বলে, সামনে চুপ থেকে আড়ালে আবর্জনাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। যাতে এই আবর্জনার প্রভাবে আর কিছু না পঁচে।’

কী জানি কেন হেমলতার শেষ কথাগুলো পদ্মজার রগে রগে শিহরণ জাগায়। সে দূরে চোখ রেখে কিছু ভাবতে থাকে। মানুষের জীবনে কত গল্প! কত যন্ত্রনা! হেমলতা নৌকা ঘুরাতে বলেন। মোর্শেদ নৌকা ঘুরায়। বাড়ি ফিরতে হবে। আজ পদ্মজার গায়ে হলুদ। নৌকা চলছে ঢেউয়ের তালে তালে। আগের উত্তেজনাটা আর কাজ করছে না। একটা ইঞ্জিন ট্রলারের শব্দ পাওয়া যায়। চার জন চকিতে সেদিকে তাকায়। ট্রলারে একজন

লোক। আরেকজন ট্রলারের ভেতর থেকে সাদা কাপড়ে মোড়ানো কিছু একটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। আবছা আলোয় সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি দেখে পূর্ণার পিলে চমকে উঠল। মানুষ মরার পর সাদা কাপড়ে যেভাবে মোড়ানো হয়,ঠিক তেমন। পর পরই লোক দুটি মোড়ানো বস্তুটি ছুঁড়ে ফেলে পানিতে। মোর্শেদ চেঁচিয়ে উঠেন,’কে রে?’

লোক দুটি তাকায় বোধহয়। এরপর দ্রুত ট্রলারের ভেতর চলে যায়। মোর্শেদ বৈঠা দ্রুত চালিয়েও ধরতে পারল না। ট্রলারটি চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেখানে সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি ফেলা হয়েছে,সেখানে মোর্শেদের নৌকাটি পৌঁছাতেই হুট করে পদ্মজা ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে। হেমলতা আকস্মিক ঘটনায় চমকে যান। আতঙ্ক নিয়ে ডাকেন,’পদ্ম...”

পদ্মজার দেখা নেই। তিনি নৌকা থেকে ঝাঁপ দিতে যাবেন তখনি পদ্মজা ভেসে উঠে। হাতে সাদা কাপড়ে মোড়ানো বস্তুটি। পদ্মজা মুখ তুলেই হেমলতাকে বলল,'আম্মা,আমি ঠিক ভেবেছি। এটা লাশ।'

পূর্ণা লাশ শুনেই কাঁপতে থাকে। অথচ পদ্মজা স্থির,ঠান্ডা।এই শেষ রাত্রিরে নদীর জলে ভেসে আছে দু'হাতে মৃত মানুষ জড়িয়ে ধরে!

চলবে...